আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৭

'টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ও বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর অধিকার' শীর্ষক

আলোচনা সভা

৬ আগস্ট ২০১৭, আজিমুর রহমান কনফারেন্স হল, দি ডেইলি স্টার সেন্টার, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

আয়োজনেঃ

বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কাপেং ফাউন্ডেশন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বাংলাদেশের আদিবাসী নারী

ফাল্গুনী ত্রিপুরা[১]

ক. ভূমিকা

২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals- SDGs) বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বিশ্ব ৫০-৫০: লিঙ্গ সমতায় অগ্রায়নে এগিয়ে চলা' (Planet 50-50: Step It Up for Gender Equality)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সমাপ্তির পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সমন্বয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি টেকসই বৈশ্বিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ১৭টি অভীষ্ট চিহ্নিত করে এসডিজি গৃহীত হয়। এসডিজির ৫ নম্বর লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে 'নারী ও কন্যাশিশুর সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন'।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) প্রণয়ন ও গ্রহণের সময় বিশ্বের আদিবাসী জাতিসমূহ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় তাদের সম্পৃক্তকরণ ও দৃশ্যমানতা নিশ্চিতকরণের দাবি জানালেও তাতে আদিবাসীরা উক্ত এমডিজিতে অদৃশ্যমান থেকে যায়। সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসী জাতিসমূহের বিশেষ প্রেক্ষাপট পূর্ণাঙ্গ বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অগ্রগতি সূচকে আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়ন ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকারগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আদিবাসী জাতিসমূহকে সাধারণভাবে এমডিজি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

তবে আদিবাসীদের নিবিড় লবি ও ক্যাম্পেইনের ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন কালে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসীদের ছয়টি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকদের কৃষি উৎপাদন ও আয় সংক্রান্ত ২.৩ নং লক্ষ্য এবং শিক্ষার সকল স্তরে সম প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ৪.৫ নং লক্ষ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া মানবাধিকার, সমতা, বৈষম্যহীনতা, স্বায়ীত্বশীলতা ও অধিকার-দাবিদার কর্তৃক অংশগ্রহণের নীতির উপর ভিত্তি করে এসডিজির কাঠামো দাঁড় করা হয়েছে যা আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আদিবাসীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে স্বাধীন ও পূর্বাবহিত পূর্বক সম্মতির অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন অধিকার তথা আদিবাসীদের আইনী স্বীকৃতি এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারসমূহ জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। একইভাবে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল উন্নয়ন পদ্ধতিও আদিবাসীদের অধিকার ও স্বকীয় সংস্কৃতি সুরক্ষায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

খ. এসডিজি ও আদিবাসী নারী

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ গৃহীত হয়। এটি মূলত মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল ২০১৫ (এমডিজি) এর পরবর্তী কর্মসূচি এবং তাদের সফলতা ও সীমাবদ্ধতার উপর নির্মিত। ২০১৫ এর পরবর্তী বৈশ্বিক এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭টি অভিষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার সংকলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ নামে পরিচিত যাকে সংক্ষেপে আমরা এসডিজি বলে থাকি।

[১] এই প্রবন্ধ/ধারণাপত্রটি প্রস্তুতকরণে সহায়তা করেছেন কাপেং ফাউন্ডেশনের সদস্য মানিক সরেন ও উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমা।

এই এসডিজির পাঁচ নম্বর অভীষ্টটি সকল নারীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে লিঙ্গসমতা অর্জন এবং কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী আদিবাসী নারীরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার হয়; প্রথমত নারী হিসেবে, দ্বিতীয়ত আদিবাসী হিসেবে এবং তৃতীয়ত আদিবাসী নারী হিসেবে। এছাড়া বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতি এবং সমাজের বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে আদিবাসী নারীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত রাখা হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আদিবাসী নারীরা খুব কমই সুযোগ পেয়ে থাকে। অন্যদিকে সামরিকায়ন এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতেও আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে। অথচ আদিবাসী নারীরা অপরাপর নারীদের মত নিজ নিজ কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য যেমন অবদান রাখে তেমনি টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য উৎপাদন, এমনকি আদিবাসীদের চিরায়ত জ্ঞানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা তথা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্পেশাল রেপোর্টিয়ার ভিক্টোরিয়া টাওলী কর্পূস এর মতে, ``Land appropriation is not gender neutral and indigenous women's rights interact with violations of collective land rights. The gendered effects of those violations become manifest in situations where indigenous women lose their traditional livelihoods, such as food gathering, agricultural production, herding, among others, while compensation and jobs following land seizure tend to benefit male members of the indigenous communities."

ভূমি বেদখল বিষয়টি লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয় এবং সমষ্টিগত ভূমি অধিকার লঙ্ঘনের সাথে আদিবাসী নারী অধিকার সম্পৃক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যখন আদিবাসীদের সমষ্টিগত ভূমি মালিকানা লঙ্ঘিত হয় তখন আদিবাসী নারীরা খাদ্য সংগ্রহ, কৃষি উৎপাদন প্রভৃতি ঐতিহ্যগত জীবিকা হারিয়ে থাকে, অথচ তার ফলে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা হিসেবে কেবল আদিবাসী পুরুষেরাই চাকরি এবং ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী নেত্রী জোয়ান কারলিং বলেছেন এসডিজিতে আদিবাসী প্রসঙ্গে ৬টি[২] গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। ফলে এটি আদিবাসীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজিতে আদিবাসীদের যেসব বিষয় বলা হয়েছে তাহলো:

- এই এজেন্ডাকে বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। অনুন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়নে আদিবাসীদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- আদিবাসীদের মৌলিক বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তাদের জীবন-জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার, আদিবাসী এলাকা এবং সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসীদের রয়েছে ঐতিহ্যগত জ্ঞান। তাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে এবং এই জ্ঞান নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বনের সাথে সম্পর্কিত জীবন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে।
- এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক যে দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলো সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কমিশন এবং আন্তঃসরকারি নানা সংস্থা এবং ফোরাম এসডিজির অগ্রগতি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ করবে। আদিবাসী এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসকল কার্যক্রমের সাথে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম সহযোগিতা করবে।

[২] বৈচিত্র্য বৈভব, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫, পৃ-২

- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় সামনে এগিয়ে যাবে, তাহলে আমাদের পৃথিবী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তা সকলের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

গ. এসডিজি ও বাংলাদেশের আদিবাসী নারী

স্বাধীনতার চার দশকে অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন একটি বৈশ্বিক দৃষ্টান্ত। নারী-পুরুষ বৈষম্য বা জেন্ডার ব্যবধান হ্রাসে বাংলাদেশের অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নীত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সামগ্রিক নারী সমাজের সাথে আদিবাসী নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছে এবং নিজ সমাজের উন্নয়নে, আদিবাসী অর্থনীতিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন ৫৪টির[৩] অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসীর অর্ধেক অংশ নারীদের যুগ যুগ ধরে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বৈষম্য, বঞ্চনা, নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে। যা তাদের টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্বের পথকে রুদ্ধ করে তুলছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশ সেই অর্জনকে কাজে লাগিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নেও জাতীয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে বর্তমান সরকার প্রচার করছে।[৪] বস্তুত: আদিবাসী, বিশেষ করে আদিবাসী নারীরা সেই স্বপ্নের যাত্রায় শরীক হতে চায়। এমডিজি থেকে দেশের আদিবাসীরা সুফল লাভ করেনি। তাদের কাছে পৌঁছেনি এমডিজি সেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ছোঁয়া। তাই তারা এসডিজি বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চায়। তারা পিছিয়ে থাকতে চায় না।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৫/১৬-২০১৯-২০) বেশ কিছু উদ্যোগের কথা বলা হলেও তা খুব যথেষ্ট নয় বলেই আদিবাসীরা মনে করে। বিশেষ করে আদিবাসী নারী সমতা ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। তার উপর যেটুকু উন্নয়ন নারীরা নিজেদের সাহসিকতা ও দক্ষতায় করছে সেটির উপর পানি ঢেলে দিচ্ছে আদিবাসী নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা।

১. আদিবাসীদের স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান:

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি পৃথক পরিসংখ্যান, যা আদিবাসীদের অগ্রগতি প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই এসডিজিতে আয়, লিঙ্গগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, প্রতিবন্ধী, ভৌগলিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য বা পরিসংখ্যান গড়ে তুলতে রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পৃথক কোন পরিসংখ্যান নেই। জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এসডিজি বাস্তবায়ন সফল করতে গেলে এবং 'কাউকে পেছনে ফেলে না রাখা' – এসডিজির অন্যতম এই স্পিরিট বাস্তব রূপদান করতে চাইলে অবশ্যই এসডিজি বাস্তবায়নে আদিবাসী জাতিসমূহকে দৃশ্যমান করতে হবে, তাদের অর্থবহ অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং তজ্জন্য আদিবাসীদের পৃথক পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকদের কৃষি উৎপাদন ও আয় সংক্রান্ত ২.৩ নং লক্ষ্য এবং শিক্ষার সকল স্তরে সম প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ৪.৫ নং লক্ষ্য সফলভাবে এগিয়ে নিতে চাইলে আদিবাসীদের পৃথক পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. শিক্ষা:

এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার সকল স্তরে সম প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ৪.৫ নং লক্ষ্য। সরকার তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলেছে- শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডারসমতায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। তবে আদিবাসী নারী ও শিশুর শিক্ষার অধিকারের চিত্র খুবই নাজুক। আদিবাসী নারী এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারের ইস্যুটি প্রায় উপেক্ষিত। এ নিয়ে খুব বেশী আলোচনাও করা হয় না এবং এই বিষয়ে পৃথক ও বস্তুনিষ্ঠ তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ কারণে দেশের আদিবাসী নারী ও শিশুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য। তবে পর্যবেক্ষণে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের আদিবাসী নারী ও শিশুরা দুই ধরনের অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়- প্রথমত আদিবাসী হিসেবে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, দ্বিতীয়ত নারী ও শিশু হিসেবে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদের অনুস্বাক্ষরকারী হলেও প্রতিনিয়ত আদিবাসী শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটির বাংলাদেশের উপর

[৩] বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
[4] Bangladesh to lead by example in SDGs, The Daily Star, 01 October 2015.

নিয়মিত পর্যালোচনায় পরিস্থিতির চিত্র করুণভাবে ফুটে উঠেছে। শিশু অধিকার সনদের (CRC) অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে "যেসব দেশে জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছে সমাজের অন্যান্যদের সাথে নিজ সংস্কৃতি বজায় রেখে, ধর্মের অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং চর্চা করা অথবা নিজ ভাষা ব্যবহারের প্রয়োগে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" এই অনুচ্ছেদে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষার অধিকারকে নিশ্চয়তা দেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে আদিবাসী শিশুরা প্রায়ই এই ইস্যুতে বৈষম্যের শিকার হয়।

আদিবাসী নারী ও শিশুদের অধিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশ্র উন্নয়ন হলেও তাদের শিক্ষা অধিকার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ হিসেবে এ বছর ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি ভাষাসহ দেশের মোট পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ৫০ হাজার বই ছাপিয়ে বিলির ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এই কর্মপ্রয়াস প্রসংশনীয় হলেও বস্তুত সরকারের এই উদ্যোগ ছিল দায়সারা গোছের ও পরিকল্পনাহীন। ফলে অনেক আদিবাসী ছাত্রছাত্রী মাতৃভাষার বই পায়নি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাবে উক্ত মাতৃভাষার বই পড়ানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

৩. স্বাস্থ্যঃ

এসডিজির অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা। পাহাড়ে জনবসতি বেড়ে যাওয়ায় পানির ঝর্ণাধারা (যেটি স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষায় ছড়া বলা হয়) আগের মত নেই । ফলে নদী বা ঝর্ণাগুলো দূরবর্তী হওয়ায় পানি আনা-নেওয়ার সময় আদিবাসী নারী ও শিশুরা অনেকসময় সহিংসতার শিকার হয় মারাত্মকভাবে। বান্দরবানের মত দুর্গম এলাকায় যেখানে পাহাড়ী ছড়াই একমাত্র পানির উৎস হিসেবে কাজ করে সেখানে পাথর উত্তোলনের ফলে ঝর্ণাগুলো দূষিত হয়েছে অথবা শুকিয়ে গেছে। আদিবাসীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থাও খুব ভাল নয়। গ্রামগুলো দুর্গম এলাকায় হওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীরা সেসব এলাকায় যেতে চান না। ফলে সেসব এলাকার লোকজন এখনো ঝাড় ফুক বা হাতুড়ে ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল। ২০১৬ সালের আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এটা উঠে এসেছে যে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী নারীদের মাতৃ মৃত্যুহার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি এবং আদিবাসী নারীরা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা এবং দক্ষ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ না থাকার কারণে প্রতি বছর অনেক আদিবাসী নারী ও শিশু মারা যাচ্ছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গত জুলাই মাসে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রতিষেধক টীকা ও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে ১০ জন ত্রিপুরা শিশু মারা যাওয়া এবং আরো ৭৫ জন শিশু রোগে আক্রান্ত হওয়া। সীতাকুন্ডে যে কয়জন শিশু মারা গেছে তার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অপুষ্টিজনিত ও টিকার অভাব। ফলে আদিবাসী গ্রামগুলো শুধু ম্যালেরিয়া বা ডায়রিয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত নয়, বরং সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

অধিকাংশ আদিবাসীদের বসতি দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় আদিবাসীরা, বিশেষ করে নারীরা সীমিত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুরা কম ওজনে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এটা কেবল শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য নয়, চরম পুষ্টিহীনতাও এর একটি অন্যতম কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশী। এই চিত্র দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জাতিসমূহের বেলায় আরো বেশী করুণ তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪. মানবাধিকার, সমতা ও বৈষম্যহীনতাঃ

২০৩০ এজেন্ডায় সার্বজনিন মানবাধিকার সনদ ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-ভাষা-ধর্ম-রাজনৈতিক বা অন্যান্য মত, জাতীয় ও সামাজিক বংশগত, সম্পদ, জন্ম, প্রতিবন্ধী বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে কোন বৈষম্য না করে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান প্রদর্শন, সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য রাষ্ট্রসমূহের আহ্বান করা হয়েছে। একই সাথে ২০৩০ এজেন্ডায় লিঙ্গ সমতা এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে (৫নং লক্ষ্য) জোর দেয়া হয়েছে। এই এসডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ২০৩০ এজেন্ডায়। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় এসডিজি বাস্তবায়নে আদিবাসী জাতিসমূহকে, বিশেষ আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের সম্পৃক্তকরণের কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে।

জাতীয় সংসদে নারীদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি নারীদের ক্ষমতায়ন করেছে। তবে সরকার স্বীকার করেছে বেশকিছু কারণ যেমন: নারী শ্রম শক্তি হ্রাস, মজুরি বৈষম্য, উচ্চতর সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে নারীদের কম

অংশগ্রহণ, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া ইত্যাদির কারণে জেন্ডার সমতার বিষয়টি মাঝে মাঝে নিম্নগামী হয়ে যায়[৫]। তবে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে: সংবিধানে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পৌরসভাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য আইন পাস হয়। এতে জাতীয় স্তরে ও স্থানীয় প্রশাসনে নজীরবিহীনভাবে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আদিবাসী নারীদের জন্য জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে কোন আসন সংরক্ষিত নেই। বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটেও আদিবাসী নারীদের জন্য পৃথক কোন বরাদ্দ নেই। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকেও আদিবাসী নারীদের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক কাজে ও আদিবাসী নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিশেষ বরাদ্দ নেই। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ সেখানেও আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য বিশেষ কোনো কিছু উল্লেখ নেই।

সরকারের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন, পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানির বিপক্ষে গাইডলাইন (২০১০), বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় জন্ম সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশনা, অতি সম্প্রতি বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ প্রণয়ন করা সত্বেও নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যাসহ নারীর উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করেনি।

২০১৬ সালের রিপোর্টে এটা স্পষ্ট যে, সমতলের আদিবাসী নারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের অপেক্ষা বেশি সহিংসতার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তারা সহিংসতার শিকার হিসেবে সহজেই টার্গেটে পরিণত হন। সরাসরি শারীরিক ও যৌন নিপীড়ন ছাড়াও সহিংসতার অন্য ক্ষেত্র হচ্ছে মানসিক নির্যাতন/সহিংসতা, আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ, পারিবারিক নির্যাতন/সহিংসতা ইত্যাদি, যেগুলো খুব একটা প্রকাশিত হয় না বা আলোচিত হয় না। আলোচিত হলেও ব্যাপক আকারে হয় না।

এবছরের জুন মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ৩২ জন আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আর গতবছর সারাদেশে আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি ৫৩টি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। সংঘটিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ২৮টি পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং ২৫টি সমতলে সংগঠিত হয়েছে। পুরো বছর জুড়ে ৫৩টি ঘটনায় ৫৮ জন আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশু শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ৬ জন আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুকে হত্যা ও ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। সংঘটিত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ৮৫% ঘটনা অআদিবাসী কর্তৃক এবং ১৩% আদিবাসী দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তবে এটা উদ্বেগজনক যে, ২% ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।[৬]

আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সহিংসতার চিত্র (২০১৩-২০১৭ জুন পর্যন্ত)

বছর	ধর্ষণ/ গণধর্ষণ	ধর্ষণের পরে হত্যা	শারীরিক নির্যাতন	ধর্ষণ চেষ্টা	অপহরণ	যৌন নির্যাতন	পাচার	মোট
২০১৩	১৫	৪	১৬	৯	৫	১০	৮	**৬৭**
২০১৪	২১	৭	৫৮	২২	১০	৪	০	**১২২**
২০১৫	২৮	৩	২১	১৭	৫	৯	২	**৮৫**
২০১৬	২৬	৬	৮	১০	৬	২	০	**৫৮**
২০১৭*	১০	৩	৩	৮	২	৬	-	**৩২**
সর্বমোট	**১০০**	**২৩**	**১০৬**	**৬৬**	**২৮**	**৩১**	**১০**	**৩৬৪**

* জানুয়ারি-জুন ২০১৭ পর্যন্ত

উপরোক্ত সারণী প্রমাণ করে এদেশে আদিবাসী নারীদের বর্তমান দৈনতার চিত্র। তবে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীসহ সকল প্রকার সহিংসতায় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ

[৫] ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-২০১৯/২০), পৃ-১০

[৬] বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৬

করতে পারছেনা। যা নারী সমতা ও ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়াচ্ছে নারীদের প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি। ফলে সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম একটি লক্ষ্য নারী সমতা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদিবাসীদের নারীদের অবস্থা কতখানি উন্নত হবে সেটি প্রশ্ন থেকেই যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা অনেকটা জুম্ম স্বার্থ-পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় যদি সেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বশাসন ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী অধিকার না থাকে এবং সেই উন্নয়ন কার্যক্রম যদি জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যার কারনে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসী নারীর জীবন-জীবিকার উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন এগিয়ে যেতে পারছে না।

ঘ. ২০১৭ সালের Voluntary National Review (VNR) প্রক্রিয়া

২০১৭ সালে জুলাই মাসে এসডিজি বাস্তবায়নের উপর দ্বিতীয়বারের মত নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের সময় **Voluntary National Review (VNR)** অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে আদিবাসী প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছে। এবছর ৪৪টি **VNR** দেশের মধ্যে বাংলাদেশেরও এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে যে **VNR** প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় সেখানে এই প্রতিবেদন তৈরীর পূর্বে আদিবাসীদের সাথে যথাযথ আলোচনা না হওয়ার কারণে আদিবাসী নারী ও কণ্যা শিশুর সার্বিক উন্নয়নের পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা সেখানে সরকার উল্লেখ করতে পারেনি। অথচ ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামেরও অন্যতম সুপারিশ ছিল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে আদিবাসী জাতিসমূহকে সম্পৃক্ত করা। কিন্তু ২০১৭ সালের বাংলাদেশের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে আদিবাসীদের সাথে কোন পরামর্শ ও মতবিনিময় করা হয়নি।

ঙ. সুপারিশ

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা, উচ্চমান সম্পন্ন পুষ্টি এবং কৃষির স্থায়িত্বশীলতা এবং ক্ষুধামুক্ত করা (লক্ষ্য ২), সকলের জন্য মানসম্মত এবং জীবনব্যাপি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা (লক্ষ্য ৪), স্থানীয় উন্নয়নের জন্য আমাদের পরিবেশ ও মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং বনজ সম্পদকে রক্ষা করতে না পারলে ভূমি এবং জীববৈচিত্র্য অর্ধেকে নেমে আসবে (লক্ষ্য ১৫) এসব লক্ষ্যে যদিও খুব স্পষ্টভাবে আদিবাসীদের কথা উল্লেখ রয়েছে তবে এসডিজির সকল লক্ষ্যই আসলে সবার জন্য প্রযোজ্য। টেকসই উন্নয়নের মূল কথাই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকারকে অবশ্যই বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীদের সাথে নিয়েই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে অর্জন করতে হবে। বৈশ্বিক এই প্রক্রিয়ায় যেমন উন্নত বিশ্বের নারীরা থাকবেন, মধ্যম আয়ের দেশের নারীরা থাকবেন, উন্নয়নশীল দেশের নারীরা থাকবেন তেমনি বিশ্বের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী নারীরাও থাকবেন।

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও হাওর অঞ্চলের মত আদিবাসী অধ্যুষিত দুর্গম এলাকাগুলোতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক ও দেশীয় পর্যায়ে আদিবাসী নারী যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নিম্নে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বেশকিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হলোঃ

১. সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

২. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ সর্ম্পকে আদিবাসী ও নারী সংগঠনগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৩. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং এলক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করা;

৫. নারী উন্নয়ন নীতিমালায় আদিবাসী নারীদের জন্য আলাদা একটা অধ্যায় রাখা এবং সকল ধরনের নীতিমালা গ্রহনের পূর্বে আদিবাসী নারী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা;

৬. আদিবাসী নারীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭. ভূমি ও সম্পত্তির উপর আদিবাসী নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং বন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা;

৮. শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করা এবং বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিশ্চিত করা;

৯. জাতীয় সংসদে অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;

১০. সমতলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা ।